Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মজা গাঙের গান : নবজীবনের উদ্বোধন

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আব্দুর রশীদ
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v50i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.8
Pages	১৭৫-১৮৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মজা গাঙের গান : নবজীবনের উদ্বোধন

Check for updates

মোঃ আব্দুর রশীদ*

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শামসুদ্দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এদেশের সমাজ-জীবনের গভীরে প্রোথিত তাঁর শিল্পী-মানস। বাংলার জন-জীবনের বিচিত্র বিষয় তাঁর রচনাতে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখার প্রাথমিক পর্ব থেকেই তিনি এদেশের সমাজজীবনের বিভিন্ন জনপদ ও ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী। যে-সব ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে আন্দোলিত করেছে, সেসব তিনি অবলীলায় তুলে ধরেছেন সাহিত্যের শিল্পভাষ্যে। কর্মসূত্রে তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন না কেন তাঁর মনোবীণায় সব সময় স্বদেশ-ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করতেন। সাহিত্য-সাধনার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত স্বদেশ-ভাবনা এবং স্বদেশের মূল্যবোধ তাঁকে সাহিত্য-রচনাতে প্রেরণা যুগিয়েছে। স্বদেশ-বিনির্মাণ এবং স্বদেশ-অন্বেষা তাঁর শিল্পীমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি আপন অস্তিত্বে দেশ এবং দৈশিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কলেবরে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কথাসাহিত্যে অবয়ব সংস্থান ও প্লটের উপর গুরুত্বারোপ করেন নি, যতটা করেছেন বিষয় বা বক্তব্যের উপর। তিনি শিল্প-সচেতন নন, বিষয়-সচেতন কথাসাহিত্যিক।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ছাত্রজীবনেই রচনা করেন বিখ্যাত "শাহের বানু" গল্পটি। তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে সমাজসচেতন কথাশিল্পী হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৯৪৬ সালে বরিশাল থেকে প্রকাশিত "সাত-সতেরো" পত্রিকার (কবিতার সংকলন) প্রকাশক হিসেবেও তিনি কাজ করেন। উত্তাল চল্লিশের দশকে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং একই সাথে সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। এখানে উল্লেখ্য, একজন সাহিত্যিকের শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে তাঁর স্বকাল, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা এবং রচনাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পমানস-সন্ধানে আমরা তাঁর স্বকাল, বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠি-পত্র ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার দ্বারস্থ হব। এছাড়াও গল্পকারের শিল্পীমানস উন্মোচন প্রয়াসে লেখা কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্যও এখানে তুলে ধরব।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পীসত্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৫) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কানু শিকদারের সংলাপের মাধ্যমে। তিনি যেন এ সংলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনার পথকেই নির্দেশ করেছেন :

> বধূ আমি ভুবন ভ্রমিয়া অবশেষে জানিয়াছি জননী জন্মভূমি বাস্তবিকই স্বর্গাদপি গরীয়সী।...ভালবাসা ব্যাপ্ত হয়, কখনও কখনও কন্যার জন্য, কখনও রূপাতীত আরও

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি কে. সি. কলেজ, ঝিনাইদহ।

ব্যাপকতর কাহারও জন্য। তখন কেবল আর মন বাঁধা পড়িয়া থাকিতে চাহে না আত্মসুখে, আসে নিজেকে বিলাইয়া বিশ্বপ্রেমে পাগল হইবার উন্মাদনা।...এই দেশ, এই মানুষ, এই প্রকৃতি জীবনের এক তুলনাবিহীন রূপ; এই প্রেম জীবনের প্রতি প্রেমেরই কঠোর কোমল অধ্যায়। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৫৫ : ৯)

এ সূত্রেই স্মরণ করা যেতে পারে সমালোচকের উক্তি : এ-দেশের 'মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি এবং প্রতাপশীল জীবনধারার প্রতি তাঁর আগ্রহ সব সময় একই রকমের। স্বদেশ ও বিশ্বের প্রকৃতি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের পরিচয় বিভিন্ন রচনায় বিধৃত হয়েছে।...প্রবাস জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়েও স্বদেশের মাটি-মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর প্রীতি ও মমত্ববোধ।' (মান্নান, ২০০৮ : ৫৪, ৫৫) গল্পকার বিভিন্ন সময় তাঁর বন্ধু আবদুল মতিনের সাথে সাহিত্য-বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা করতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পত্রালাপের মাধ্যমেও সে-সম্পর্ক বজায় রাখতেন। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর এই বন্ধুকে সাহিত্যের দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত এক চিঠিতে উল্লেখ করেন :

আপনার মনে পড়ে, 'দি গার্ডেন অব কেইন ফ্রুটস'-এর মানিক যখন বন্দুক হাতে নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছে, কার জন্য, কিসের জন্য এই যুদ্ধ? তখন কি আপনারও মনে পড়ে নি, সে প্রশ্ন আপনারও, কেন লিখি? কী জানেন আপনার 'দেশ' সম্পর্কে— একটা মানচিত্র, একটা রাজত্ব, না কোনও 'আইডিয়া'? যদি সেই 'আইডিয়া'-ই হবে তবে তার বাস্তবসম্মত ভিত্তি কী? সেই বাস্তবের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন ও যৌথজীবনাচারের সম্বন্ধ কী? (মতিন, ২০০০ : ২৮)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যেমন সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তেমনি মনোযোগী ছিলেন সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে। তিনি কৃত্রিম ভাষাকে সচেতনভাবে পরিহার করে মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের মুখের ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। অন্য এক পত্রে তিনি তাঁর সাহিত্যের ভাষা এবং বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

আমি সেই বাল্যকাল হইতে নিজ জন্মভূমি এবং সমাজ-জীবন-সম্পর্কীয় প্রায় সকল লেখাতেই পোশাকী-বাংলা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই কারণে বহুজনই আমাকে প্রাচীনপন্থী এবং বঙ্কিমী বাংলার অনুসারকরূপে অগ্রাহ্য মনে করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। অথচ, আপনিও অবশ্যই জানেন, এই পোশাকী বাংলার সঙ্গে দেশ-জীবনের সহজ ও সরল সম্পর্কও এক অতি মূল্যবান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। কেবল ক্রিয়াপদ ব্যবহারেই নয়, বাক্যগঠন ও সংলাপ ব্যবহারে দেশ-প্রকৃতি, সমাজ-মানস এবং জীবন-চারিত্র্যের সঙ্গেও এই প্রাচীন গদ্য অকৃত্রিম। দক্ষিণ বঙ্গের জীবন-চিত্রণ কালে এবং ঐ দেশের গভীরতম চিন্তা-চর্যা, তথা জীবনযাত্রা অনুসরণের কালে তথাকথিত চলতি 'পশ্চিম বঙ্গীয়' অথবা কলকাতার বাংলা আমার পক্ষে আদৌ যথার্থ মনে হয় না। (মতিন, ২০০০ : ১৭০)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পীসত্তার পরিচয় বিভিন্ন আলোচকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। গল্পকারের শিল্পদৃষ্টির বিকাশের পথে আজহার ইসলাম যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য :

তিনি আশানুরূপ শিল্পসচেতন কথাশিল্পী নন। আধুনিক শিল্পচৈতন্যে বিষয়ের বাহ্যিক দিকটি ততখানি গুরুত্ব পায় না, যতখানি তার আভ্যন্তরীণ দিক। হয়তো দেখা যায় জীবনের সাধারণ একটি বিষয় তার বহিরঙ্গকে আচ্ছন্ন করে লেখককে প্রভাবিত করেছে তার আন্তর সত্যের

> প্রতি। আর আধুনিক শিল্পমতবাদে দীক্ষিত লেখক-মানস বিষয়টির অন্তর্প্লাবী বিশ্লেষণে জীবনের এমন এক সত্য আবিষ্কার করে, যা মুগ্ধ পাঠকের কাছে সেই অভিনব শিল্পসত্তার একটি নতুন দিকের পরিচয় বয়ে আনে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পমানসের উপর আধুনিক শিল্প-মতবাদের অর্থাৎ অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তববাদ ইত্যাদির কোনো প্রভাব নেই। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বাইরের দিকটিই তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। (আজহার, ১৯৯৬ : ১৫৭)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পীসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে মোহাঃ সাইদুর রহমান-এর মন্তব্যও স্মরণীয় :

> প্রকৃতিমঙ্গল, মানবমঙ্গল, জীবমঙ্গল, স্বদেশমঙ্গল ইত্যাদির সমন্বয়ে তাঁর চেতনায় একটি মঙ্গলবৃত্ত নির্মিত হয়। এই নির্মিতির প্রক্রিয়ার তিনি বহুলাংশে সংশ্লেষণাত্মক। সমস্ত উৎস থেকে মাঙ্গলিক চেতনা গ্রহণ করেন। শিল্পী হিসেবে তিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, লোকসংস্কৃতি চিহ্নায়িত জীবন, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, স্বদেশী সংস্কৃতি শনাক্তকরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব সাহিত্য-জগৎ নির্মাণে সক্ষম হন। (সাইদুর, ২০১১ : ২৮৪-২৮৫)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পীসত্তার বিকাশ ও পরিণতির মূল উৎস তাঁর দৈশিক ভাবনা। বিভিন্ন সময় তিনি বিদেশে অবস্থান করলেও স্বদেশচিন্তা ও ঐতিহ্যচেতনা তাঁর মানস-জগতে সব সময় ক্রিয়াশীল ছিল। উপরিউক্ত উদ্ধৃতি-গুচ্ছের আলোকে গল্পকারের শিল্পীমানসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে :

> (ক) তিনি তাঁর সাহিত্যে শিল্প-চেতনা অপেক্ষা বিষয়-চেতনতার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন।
> (খ) সচেতনভাবেই তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন এদেশের সমাজজীবনকে।
> (গ) গল্পকার আন্তর্তাগিদে দেশীয়-লোকজ এবং অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দকে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।
> (ঘ) সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে গল্পকার দৈশিক পটভূমিকে বেছে নিয়েছেন।
> (ঙ) গল্পকারের মানসভূমির সমৃদ্ধিসাধনে দেশমাতৃকার পরিবেশ জীবনাসক্তি দান করেছে।
> (চ) নীতি ও আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা তাঁর রচনাসমূহে অনুপস্থিত।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম দীর্ঘদিনের সাহিত্যচর্চায় কখনও এ-বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয়ভাবনা, ভাষা-ব্যবহার, পরিচর্যার উপকরণ— সর্বত্রই দেশীয় সমাজবীক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। পরিণত পর্বেও লক্ষ করা যায়, সাহিত্য রচনার বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর দৈশিক ভাবনা আরও দৃঢ়রূপ পেয়েছে এবং বাঙালি সমাজজীবনের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কসূত্রে তিনি এদেশের মনুষ্য জীবনের অন্তঃসত্যকে তুলে ধরেছেন— যা এদেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তবে, তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছোটগল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থসমূহ : *পথ*

জানা নাই (১৯৪৮), *অনেক দিনের আশা* (১৯৪৯), *ঢেউ* (১৯৫৩), *শাহের বানু* (১৯৫৪), *দুই হৃদয়ের কাব্য* (১৯৫৫), *জীবন কাব্য* (১৯৫৬), *পুঁই ডালিমের কাব্য* (১৯৮৭), *মজা গাঙের গান* (রচনাকাল ১৯৭২-৮৩, প্রকাশকাল ১৯৮৭)। উল্লিখিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে *মজা গাঙের গান* গ্রন্থটি বিশেষ কারণে স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এ-গ্রন্থের গল্পগুলোর শিরোনাম— 'রক্তের স্বাদ', 'নকল', 'নেপথ্যে', 'ওয়েভলেংথ', 'মানসকন্যা', 'মজা গাঙের গান', 'সুটকেস', 'দায়-দাবী', 'কথা' ও 'একটি প্রবন্ধের গল্প'। লেখকের সঞ্চরণশীল চেতনাতে এ-পর্যায়ে দৈশিক ভাবনা নতুন গতি সঞ্চার করে। এ-গ্রন্থে কোনো অগ্নিগর্ভ সংগ্রামের কথা নয়— শিল্প বা শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে বাঙালির সমকালীন জীবনপ্রবাহের বহুমাত্রিক রূপ ধরা পড়েছে। আবদ্ধ হৃদয়ের বদ্ধ কথাগুলো তিনি 'মজা' (বদ্ধ বা মৃত বা জলের প্রবাহ বন্ধ আছে এমন জায়গা) গাঙের প্রতিরূপে প্রকাশ করেছেন। 'মজা গাঙ' শব্দদ্বয়কে তিনি দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের প্রতিরূপে ব্যবহার করে বাঙালির স্তিমিত বা নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহে পুনরায় নবজীবনের উদ্বোধন প্রত্যাশা করেছেন। এখানে স্মর্তব্য যে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির (অন্ত্যজ শ্রেণি বা নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত) মধ্যে দৈশিক ভাবনা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পগুলোর ধারাবাহিক আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টি সহজেই স্পষ্ট হবে।

এক ॥ অন্ত্যজ বা নিম্নবিত্ত শ্রেণি-মানুষের সমাজভাবনা

মজা গাঙের গান গল্পগ্রন্থে মৃত্তিকাসংলগ্ন অন্ত্যজ বা নিম্নবিত্ত শ্রেণি-মানুষগুলোর মধ্যে দৈশিক ভাবনা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে।

এ-গ্রন্থে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাশ্রয় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু তারপরেও তারা দেশমাতৃকার মাঙ্গলিক দিক বা সংস্কৃতি থেকে অপসৃত হয় নি। জীবন এবং জীবিকার উৎসমূলে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দৈশিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সবসময় ক্রিয়াশীল থেকেছে। গল্পকারের বুকের কথা মুখে এসে কলমের মাধ্যমে ধরা পড়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির দৈশিক ভাবনায়।

'নেপথ্যে' গল্পের কাহিনিতে দারিদ্র্যের সংকট এবং উচ্চবিত্তের নিষ্পেষণজনিত সংকটটিকে আরো ঘনীভূত করার চিত্রও পেয়েছে সমান গুরুত্ব। যন্ত্রসভ্যতা এবং আকাশসংস্কৃতি এদেশের মানুষগুলোকে দিন দিন দেশীয় সভ্যতাবিমুখ-মূল্যবোধহীন করে পাশ্চাত্য সভ্যতামুখী করে তুললেও নিম্নবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রগুলোকে যে নিজ অবস্থান থেকে টলাতে পারে নি— তা গল্পের পটভূমিতে উপস্থাপিত।

গৃহে যান্ত্রিকসভ্যতার ফসল টেলিভিশনের আগমন ঘটায় নতুন আনন্দের জোয়ার জেগেছে। এ-জোয়ারে যোগ দিয়েছে পাশের বাড়ির ঝি-চাকর পর্যন্ত। কেবল সে স্রোতে নিজেকে মেলাতে পারে নি গৃহপরিচারিকা কিশোরী রোকেয়া — যা অনেকের কাছে অনভিপ্রেত। এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করা যেতে পারে : (১) তার মানসিক দীনতা অথবা (২) বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি তার বিতৃষ্ণা বা অবহেলা। দ্বিতীয় কারণটিই এখানে গ্রহণযোগ্য, কেননা পাশের বাড়ির ঝি-চাকর আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারলে

তার কুণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। লেখক বিদেশি সংস্কৃতি বর্জনের এই চিত্র তথা স্বাজাত্যবোধকে একজন গৃহপরিচারিকার নীরব প্রতিবাদের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন— যা গল্পে খুবই অর্থবহ। এখানে স্মরণীয় যে, টেলিভিশন না দেখার কারণে গৃহের সমস্ত কাজ করেও সে বাড়ির বিভিন্ন সদস্যের কাছে অকারণে বকুনি খেয়েছে। একদিকে রোকেয়া নিজের অনুভূতি অন্যকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে— অপরদিকে সেও অন্যদের অনুভূতি বুঝতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। রোকয়ার ভাবনায় গল্পকার বিষয়টিকে জীবন্ত করে তুলেছেন :

> আমি ভালো বুঝিয়া যা-ই করতে চাই, তা কেউর পছন্দ হয় না। কেউর সঙ্গে মন খুলিয়া একটা কথাও কইতে পারি না। কতো কেচ্ছা জানি, তা শুনাইতে গেলেও সকলে দূর দূর করিয়া দেয়। সক্কলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখিয়া মনে কয় এইখানে আমার ঠাঁই নাই। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৩৪)

রোকেয়া বাহ্যিকভাবে যেমন দারিদ্র্যজর্জরিত, তেমনি মানসিকচাপেও নিষ্পেষিত। কেউ তাকে বোঝার প্রয়োজন অনুভব করে নি। এমনকি গৃহকর্তার সাথে সুসম্পর্ককে অনেকে অনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্র পাশ্চাত্য সভ্যতায় গা ভাসিয়ে দেশীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দিলেও একজন গৃহপরিচারিকার দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যে আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে তাতেই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ।

এ-গল্পে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি নির্ভরতা, দৈশিক মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সংঘর্ষের স্বরূপটি স্পষ্ট। তাছাড়া সমাজস্থ মানুষের মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। দৈশিক মূল্যবোধের যে পতন ঘটেছে তা রোকেয়ার প্রস্থানের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতি যে তিরোহিত হতে চলেছে গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের পাশ্চাত্যমুখিতা তা-ই প্রমাণ করে। অপরদিকে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের মধ্যেও গল্পকার নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি রোকেয়ার নিস্তরঙ্গ জীবনে বিদেশি সংস্কৃতি বর্জনের যে চিত্র এঁকেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

'মজা গাঙের গান' গল্পটি গ্রন্থের নামগল্প এবং এ-গল্পটিই নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান গল্প হিসেবে স্বীকৃত। গল্পটি আত্মবিলুপ্ত নিম্নবিত্ত মানুষের আত্ম-অস্তিত্ব আবিষ্কারের ফল। জীবন ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যাওয়া বরুজান ও কঙ্কালসার বৃদ্ধের নতুন জীবনে পদার্পণের চিত্রটি গল্পে পরিস্ফুটিত। 'ছেলেদের তাড়া খেয়ে' রোগ-শোক আর অভাব-অভিযোগতাড়িত বৃদ্ধটি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ভারতবর্ষীয় সমাজের আদি পেশা ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয়। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে যখন তার অস্তিত্ব-সংকট তীব্রভাবে প্রকটিত হয় তখন সে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে। স্বার্থমগ্ন উত্তর পুরুষের কাছে তাঁর আশ্রয় হবে না জেনে তারই আত্মীয়া আরেক অস্তিত্ব সংকটাপন্ন বরুজানের কাছে জীবনের তীব্র আর্তি নিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে জীবনের প্রয়োজনে বয়সের ভারে প্রৌঢ় হয়েও দুটি মানুষ নতুন করে সংসার গড়তে তৎপর হয়। কারণ সে জানে বরুজানই তার জীবনের শেষ আশ্রয়। তাদের পক্ষে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব না হলেও তারা শেষ চেষ্টা করে

দেখতে বদ্ধ পরিকর : "যা হউক, যা হয়েছে। যা গেছে, গেছে। এখন সামনে কী আছে দেখন যাউক।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭: ৫৯) এ-সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের শীর্ণকায় শক্ত মনের পরিচয় লেখক উপস্থাপন করেছেন। কারণ, পাশে প্রবহমান মজা গাঙটি তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে : "ঐ যে গাঙটা মাটির তলায় মজে গেছে তারও মধ্যে একটু খুঁড়লেই এখনও টলটলে পানি।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৬০) দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও তাদের নিস্তরঙ্গ জীবন খুঁড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে ব্যাপৃত। তাই তারা ভাঙা-চোরা লতাপাতার আড়, এলোমেলো কলাগাছের ঝাড় পরিপাটি করে সাজিয়ে একজোড়া তরুণ-তরুণীর মতো উচ্ছল হয়ে সংসার সাজাতে তৎপর হয়ে ওঠে। বরুজান চরিত্রটি অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের প্রতীক। অন্যদিকে বৃদ্ধ মানুষটি নামহীন; সে তার নামহীনতার মতোই অস্তিত্বহীন। উভয় চরিত্রের মধ্যে বেঁচে থাকার আর্তি তীব্র। তাই তারা একে অপরকে কাছে পেয়ে আবার নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়। অস্তিত্বহারা মানুষের অস্তিত্ব আবিষ্কারের আনন্দ তাদের নতুন সংসার জীবনে পদার্পণে অভিব্যক্ত।

'মজা গাঙের গান' গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের ঐতিহ্যপ্রীতি, দেশপ্রেম এবং মূল্যবোধের শিকড় সন্ধানের স্বরূপ প্রকাশিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, যান্ত্রিক-জীবনের স্বার্থমগ্নতা, জীবনপ্রবাহের বৈরীচক্র, বাঙালির সহজ-সরল জীবনযাপন প্রণালিকে করেছে বাধাগ্রস্ত। বাঙালি সমাজে প্রচলিত একসময়ের মূল্যবোধ যা একে-অপরকে কাছে বেঁধে রেখেছিল তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়েছে দারুণভাবে ব্যাহত। যে গাঙটি গ্রামবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তথা ভাত-মাছের উৎস ছিল একসময় সে গাঙটি পরিণত হয় মজা গাঙে। এ-কারণে তাদের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সুখ-স্বপ্নেরও মৃত্যু ঘটেছে। অথচ সেই মজা গাঙটি এখনও মানুষের বেঁচে থাকা ও আশ্রয়ের প্রতীক। এ-কারণেই গল্পের শেষ দিকে মজা গাঙের 'চ্যাকম্যাকা' মাছ অন্ত্যজ-শ্রেণির বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংসারে ভোগের আয়োজনে উপস্থিত। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তারা দেশ, ঐতিহ্য মূল্যবোধের জয়গান করেছে, যা তাদেরকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছে : "মনে কয় ঐ মাছ আমিও কিছু ধরিয়া আনিতে পারি। অনেক কাদার তলায় থাকে তো, কেউর বড় একটা চোখে পড়ে না। বাপজানে কেমন করে ধরছে তা আমি দেখছি।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৬৩)

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'মজা গাঙের গান' গল্পটির সাথে শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫২) গ্রন্থের অন্তর্গত 'নতুন জন্ম' গল্পটির সাদৃশ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে নদী ও মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন এবং সাহিত্যেও তা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। উভয় গল্পে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী বা গাঙকে আশ্রয় করে নিম্নবিত্ত মানুষগুলো বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। 'মজা গাঙের গান' গল্পের মুখ্য চরিত্র বুরুজান, কঙ্কালসার বৃদ্ধ এবং গাঙ (ভিন্ন অর্থে নদী)— অপরদিকে 'নতুন জন্ম' গল্পের প্রধান চরিত্র ফরাজ আলি, তার পুত্র আব্বাস এবং গোমতী নদী। ফরাজ আলি এবং তার পুত্র গোমতীর ভাঙা-গড়া ও প্রতিকূলতার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করেছে। প্রতিবেশী ব্যক্তিটির শহরে যাওয়ার প্রস্তাবে ফরাজ আলি নির্বিকার চিত্তে জানিয়ে দেয় : "যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত, আর কোথাও মন লয় না। দ্যাহো, চুলের লাহান স্রোতের

গেরো।" (বুলবুল, ২০০৩ : ১৫৪) কিন্তু কোন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে পুত্র আক্কাস তাকে দিয়েছে নতুন জীবনের পাঠ :

> মানসে এ্যাম্‌নে থাহে? তুমি সুসুঙের বাচ্চা, না মানসের বাচ্চা? নদীর লগে-লগে থাকার চাও, তোয়ার সরম করে না?... বিস্ময়ে তাকায় ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে।(বুলবুল, ২০০৩ : ১৫৭)

অবশেষে ফরাজ আলি গোমতী নদীর মায়া কাটিয়ে পুত্রের হাত ধরে নতুন জীবনের সন্ধান করে। "ফরাজ আলি ও তার পুত্র শুধু একখানি গামছা আর কাঁথা সম্বল করে নতুন দিনের সূর্যের প্রতীক্ষা করে। এ যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনে উত্তরণ। পুরোনো মূল্যবোধকে পেছনে ফেলে নবজন্ম লাভের শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে দিগন্ত জুড়ে।" (খালেদা, ১৯৯৭ : ৮৭-৮৮) এখানে স্মর্তব্য যে, 'মজা গাঙের গান' গল্পটির বিশেষত্ব 'নতুন জন্ম' থেকে পৃথক। কারণ 'মজা গাঙের গান' গল্পে পোড়-খাওয়া অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে গাঙ বা নদীকেই আশ্রয় করে বেঁচে থাকার নতুন নীড় রচনাতে বিভোর। অপরদিকে 'নতুন জন্ম' গল্পের চরিত্রগুলো নদীকে ত্যাগ করে বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্নে আন্দোলিত।

'মজা গাঙের গান' গল্পগ্রন্থে নিম্নবিত্ত মানুষের মনোবীণায় দৈশিক ভাবনার রূপটি সুস্পষ্ট। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বেঁচে থাকার প্রতীক দেশ। দেশীয় পরিবেশ নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হলেও তারা দেশকে আঁকড়ে ধরেই সংকট-সমস্যা এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে উত্তরণের সন্ধান করেছে। শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে নিম্নবিত্ত মানুষের আবেগ-অনুভূতি-মমত্ববোধ ও দেশপ্রেম। নবজীবনের উদ্বোধন প্রয়াসে অন্ত্যজ-শ্রেণির মানুষের দৈশিক ভাবনার রূপটি গল্পগুলোকে ভিন্নমাত্রায় উপনীত করেছে।

দুই ॥ মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৈশিকচিন্তা

মজা গাঙের গান গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্তশ্রেণি-চরিত্রগুলো সুস্থির নয়। মূলত সমকালীন প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক এবং দেশীয় প্রবহমান সময়-স্রোতের অস্থিরতাকে এ-জাতীয় চরিত্রগুলো ধারণ করে আছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে দৈশিক চিন্তা-চেতনাও দোলাচলের বেড়াজালে ভারাক্রান্ত এবং চরিত্রগুলো কখনও সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঙালি বা বাংলাদেশীয় সমাজের আত্ম-আবিষ্কার ছেড়ে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছে। তবে এ-বক্তব্যের বাইরেও কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। *মজা গাঙের গান* গল্পগ্রন্থের আলোকে বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যায়।

'রক্তের স্বাদ' গল্পটি ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে আছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল তার প্রতিচ্ছবি গল্পের কলেবরে স্পষ্ট। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একদিকে ছিল ইংরেজ রাজশক্তি বিতাড়নের প্রত্যয়, অন্যদিকে স্বাদেশিক আন্দোলনের নামে

মধ্যবিত্তশ্রেণির আত্মকলহ ও তৎসৃষ্ট নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা। লেখক দ্বিতীয় দিকটি সর্দার শীতলা এবং তার সহযোগীদের নেতৃত্বে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণীকে উদ্দেশ্যহীনভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। শীতলা ও তার সহযোগীরা স্বদেশি আন্দোলনে সৃষ্ট বিপথচারী কিছু মধ্যবিত্তশ্রেণি-চরিত্রের তরুণ। তারা স্বদেশি আন্দোলনের সুযোগে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে তৎপর। আন্দোলন সংগ্রামের নামে সমাজবিবর্জিত ছিনতাই, লুট, খুন-জখম, নারী-উৎপীড়ন প্রভৃতি কর্মের সাথে তারা সম্পৃক্ত। দৈশিক চিন্তা নয়, বরং সমাজে যে কোনো মূল্যে ব্যবসাকে (?) টিকিয়ে রাখা এবং তা প্রসারের কৌশল সন্ধানে তাদের মূল চিন্তা ব্যাপৃত। যেমন :

> : ছেই ভালো হবে।— ঐভাবে ন্যাংটা করে কোমরে একটা কলা ঝুলিয়ে দেবো।— বলে একজন পানখাওয়া দাঁত বের করে হেসে উঠলো।
> : হয়েছে চল।— শীতলা ধমক দিয়ে উঠলো : কেবল চুপ করে ছব দাঁড়িয়ে দেখলেই চলবে না। ছুনিছনি অনন্তদা'র বক্তৃতা। ছংগ্রাম জীইয়ে রাখতেই হবে। আয়। (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ১৪)

গল্পের মূল কথা গল্পের শিরোনামে অভিব্যক্ত। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মাঝে রক্তের লড়াই-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। এছাড়া এ-আন্দোলন যে মধ্যবিত্তশ্রেণির কিছু বিপথগামী মানুষের জীবন-জীবিকার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তা গল্পের শিল্পভাষ্যে বর্ণিত। তবে গল্পে জাতি বিভাজনের মূল রেখাটিকে মধ্যবিত্তশ্রেণি-চরিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত করার সাথে সময়ের পরিবর্তনের প্রত্যয়ও ধ্বনিত হয়েছে লেখকের জবানিতে।

সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙন, সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ— এ-তিনটি বিষয় 'নকল' গল্পের সংক্ষিপ্ত কলেবরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পের মূল সুর অভিব্যঞ্জিত। মিনু শিক্ষিত তরুণী— যার জ্ঞান অর্জনের প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ। কারণ, শিক্ষাই তাকে আধুনিক সমাজজীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেখিয়েছে মুক্ত জীবনের পথ। এ-পথে সামজিক ও পারিবারিক বাধা এলে সে হতে চেয়েছে ঘর ছাড়া। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ঘর ছাড়া সম্ভব হয় নি। তার প্রতিবাদ প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। ক্ষেত্রবিশেষে আত্মসচেতন মিনুর প্রতিবাদের ভাষাটি ভিন্ন, তাই তার আত্মহত্যার হুমকির মধ্যে আত্মপরাজয় নয়, প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। মিনু রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তাই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। মিনু চরিত্রের সমান্তরালে মিনুর বাবার চরিত্রটিও গল্পের মূল বিষয়কে স্পষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিনুর বাবার চরিত্রেও বাস্তববুদ্ধি ও আধুনিক চিন্তা-চেতনার সমন্বয় ঘটেছে : 'সবাই এখন নিজের একটা আইডেন্টিটি খুঁজছে। সনাতনভাবে বিয়ের মধ্যে তার সব বিলুপ্ত বলেই তো মেয়েরা এভাবে দুনিয়ার সবখানে ফুঁসে উঠছে।' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ১৭) এ-সংলাপের মধ্য দিয়ে যেন লেখকের উপস্থিতিই লক্ষ করা যায়। কেননা গল্পকার সমাজ-পরিবর্তনের মূল সুরটি

সহজেই ধরতে পেরেছিলেন বলেই মিনুর বাবার কণ্ঠ থেকে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বক্তব্যের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছেন।

'নকল' গল্পে পরিচর্যার অন্তরালেও ফুটে উঠেছে গল্পের মূল সুর : "জানালার বাইরে চোখে পড়লো (মিনুর) গাছ-গাছালি আর ফোনের তারের মধ্য দিয়ে পথ করে কয়েকটি পাখি কেমন অবলীলায় আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।"(শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ২২) এভাবে যেন প্রথাগত সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন দিনের প্রত্যাশায় মুক্ত আকাশে ছুটে চলা বিহঙ্গরূপী মিনুর হৃদয়কেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গল্পের মূলসুরটি গৃহকর্তা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক স্পষ্ট করেছেন। বাঙালি যে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে নকল-প্রবণ মানসিকতায় উপনীত হয়েছে— এ কথার প্রতিধ্বনি মিনুর বাবার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে : "নকল ছাড়া নিজস্ব এমন কী-ইবা করতে পারছি? যা কিছু নিজের ছিলো বা আছে তা ধুয়ে মুছে কী ই বা হয়েছে?" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ১৯) মূলত এ-জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে লেখক-মানস বাঙালির নিজস্বতা সন্ধানে ব্যাপৃত। কেননা এর সাথেই সম্পৃক্ত আমাদের জাতিসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মানুসন্ধানী লেখক এ জন্য জিজ্ঞাসার অন্তরালে আরেকবার সবাইকে নতুন করে জেগে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন নতুন জীবনের উদ্বোধনে।

স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের ব্যবধান, শহরের শিক্ষিত মানুষ ও গ্রামের অশিক্ষিত জীবিকা সংকটাপন্ন অস্তিত্বসচেতন-কর্মসন্ধানী মানুষের চাওয়া-পাওয়া এবং ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব 'ওয়েভলেংথ' গল্পের উপজীব্য। গল্পের কাহিনি কাঠামো শহর ও গ্রামের দুটি পরিবেশের দুটি চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে। গল্পটিতে ভিন্ন ভিন্ন দুটি শ্রেণি-পেশার মানুষের সংকট ও সুবিধা ব্যক্ত হয়েছে। একদিকে গল্পকথক এবং অন্যদিকে রহমান-এর আলোচনার সূত্র ধরে গল্পের মূলসুরটি অভিব্যঞ্জিত। শ্রমজীবী গ্রাম্য চরিত্র রহমান গল্প-কথক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে এসেছে হরিণের চমড়া বিক্রির প্রত্যাশায়। কিন্তু কথকের হরিণের চামড়া ক্রয়ের অনাগ্রহের কারণে রহমান এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছে। রহমান দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমজীবী গ্রাম্য জীবনের প্রতিনিধি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হলেও সে স্বপ্নতাড়িত। সে সচ্ছল, আধুনিক জীবনের সুযোগ-সুবিধার স্বপ্ন দেখে। রহমান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধও করেছিল কিন্তু তার ভাগ্যের চাকার কোনো পরিবর্তন হয় নি : "এই স্বাধীনতার জন্য সত্তুরের দিকে বাঘের সাহস লইয়া আউগাইয়া গেছিলাম। কিন্তু কই, আমাগো কপালে তো দেখি কিছুই জুটতে আছে না।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৪৬) তার একটি স্বপ্ন ছিল রেডিও ক্রয়ের কিন্তু মায়ের অসুস্থতার কারণে সে আশাও অপূরণ থেকে গেছে। কথক তার আগ্রহের কথা জেনে রেডিও ক্রয়ের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। রহমান নিজের আত্মসম্মানবোধ থেকে কথকের সে সাহায্য নিতে অপারগতা প্রকাশ করে : 'আমি আমার সাধ্য দিয়া সাধ পূরণ করতে চাই।' (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৪৪)— এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার চারিত্রিক দৃঢ়তাই প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে এবং আকর্ষণ পূরণের ব্যর্থতাও আছে সমানভাবে। তার রেডিও-র চাহিদা পূরণ না হলেও

চাহিদা আবার রূপ নেয় টেলিভিশনে। কিন্তু গ্রামে বসে সে টেলিভিশনের সুযোগ-সুবিধা কেন পাবে না তা সে বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়। ওয়েভলেংথ কী তা সে জানে না। মূলত এখানেই চরিত্রটির স্বপ্ন-সাধ পূরণের ব্যর্থতা।

'ওয়েভলেংথ' বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য কথাটির মধ্যে গল্পটির মূল বীজ নিহিত। শব্দটি বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা বিস্তারের সীমাবদ্ধতা, গ্রাম ও শহরের সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান সবই শিরোনামে ব্যঞ্জিত। গল্পকার দেশের সমস্ত ব্যবধানকে তিরোহিত করে একই সমান্তরালে সার্বিক উন্নয়নকে 'ওয়েভলেংথ'-এ বাঁধার স্বপ্ন দেখেছেন। গল্পটির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্পকার সেই প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন— যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবধান হ্রাস করে স্বপ্ন-সাধ পূরণের সম্ভাবনা বিদ্যমান : "অস্থির হলে চলবে কেন রহমান। একদিনেই হাজার বছরের অবস্থা দূর হতে পারেনা। তুমিও খাঁটি কোনও কাজ শুরু করো, হয়ে যাবে।"(শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৪৬)। এ-জায়গাটিকেই গল্পকার প্রতিটি গল্পে পরিচর্যায় এনেছেন— যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ আবার নতুন উদ্যমে এবং নব-জীবনের উদ্বোধনে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'মানস কন্যা' গল্পটিতে এক নিঃসঙ্গ পিতার অন্তর্বেদনার কথা ব্যঞ্জিত হয়েছে। বিগত স্ত্রীর স্মৃতিকে ধারণ করে যে মানুষটি তার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নি, সেই মেয়েটিও একদিন পিতাকে ত্যাগ করে তার দেউলিয়া জীবনের চরমসীমায় পৌঁছে গিয়েছে। বাইশ বছর পর মেয়েটি এক প্রবল জিজ্ঞাসা সাথে করে ফিরে এক অপ্রত্যাশিত প্রশ্নবাণে নিঃসঙ্গ মানুষটির হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত সে বেদনা হতে তার বাহ্যিক সমাধান বা মানসিক মুক্তির কোনো সন্ধান মেলে নি।

'মানস কন্যা' গল্পটি মূলত দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। একটি কথক, অন্যটি কথকের বান্ধবী। কিন্তু যে চরিত্রটি গল্পের অবয়ব সংস্থানে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে, গল্পে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। একটি তির্যক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গল্পের মূলধারা বিকশিত : "আচ্ছা, আমাকে কি তোমাদের জন্ম না দিলেই হতো না?" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৪৭) গল্পকথক তার মেয়ের এ-প্রশ্নটি দ্বারা ব্যথিত ও বাকরুদ্ধ হয়েছেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর 'শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না' কন্যার মুখে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে তার প্রথম যৌবনের প্রতি এমন অশোভন ইঙ্গিত তিনি প্রত্যাশা করেন নি। কেননা, তিনি তার সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে অর্থাৎ এ-মেয়েটির জন্য তার বান্ধবীর অপ্রতিহত যৌবনের আহবান উপেক্ষা করেছেন। অথচ তারই মুখে এমন অন্তর্জ্বালাময় প্রশ্ন তার পিতৃহৃদয়কে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে কথকের চারিত্রিক দুর্বলতাও লক্ষযোগ্য। যে মেয়েটির জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন সেই মেয়েটিকে তিনি তার স্নেহ-বন্ধনে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন— এখানেই তার চারিত্রিক ব্যর্থতা। হয়তো তারই বিষময় ফল তীব্র অন্তর্বেদনা। অন্যদিকে কথকের বান্ধবী চরিত্রটি যৌবনবিলাসে সংরক্ত। তিনি অতীতের সমস্ত মায়ার বন্ধন ত্যাগ করে নতুন জীবন-স্রোতে ভেসে চলার জন্য কথককে আহবান করেছেন। কিন্তু তাতে কথকের সাড়া মেলে নি। অন্যদিকে বান্ধবী চরিত্রে আধুনিক

জীবনতৃষ্ণা প্রবল হওয়াতে একই প্রশ্নবাণে তিনি অন্তঃকষ্টে ভোগেন নি। বরং জীবনকে সহজভাবে নিয়ে জীবনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পক্ষে তিনি মত দিয়েছেন।

গল্পের মূলসুরটি মধ্যবিত্ত নিঃসঙ্গ মানুষটির অন্তর্বেদনাকে ধারণ করেই অভিব্যক্ত। প্রেম-প্রীতি ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ তার অস্তিত্বকে ধারণ করে জীবনস্পৃহায় রত হয়। কিন্তু যার জন্য জীবনের আর্তি সেই রক্তের বন্ধন, দেশপ্রেমই তাকে আঘাত করে প্রতিনিয়ত— এটাই জীবনের পরম সত্য হিসেবে বিবেচিত। তারপরেও মানুষ বার বার এমন আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে সবসময়। কেননা আঘাতের মাধ্যমেই একসময় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

'কথা' গল্পটি কথনপ্রিয় বাঙালির অতিকথনের বিরুদ্ধভাব ধারণ করে আছে। গল্পটির প্রতিটি চরিত্র কথনপ্রিয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শাহেদের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সবাই বাক্যব্যয়ে বা কথনের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। মধ্যবিত্ত সংসারের সন্তান শাহেদের হঠাৎ কথা বন্ধ করে দেওয়ার রহস্যকে কেন্দ্র করে গল্পটির কাঠামো বিন্যস্ত। প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্য হঠাৎ তার কথা বন্ধ হলেও এই কথন-বিমুখতার মধ্যেই গল্পটির মূল সুর উপস্থাপিত।

পৃথিবীর প্রধান চালিকাশক্তি কথা। লোকায়ত সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কথা ছাড়া ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্যারিয়ার, যোগাযোগ, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি, বিনোদন সবকিছুই অসম্ভব। কিন্তু অতিকথনই আবার উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। এ-অতিকথনকে লক্ষ করেই কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) জননী কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫-১৯৪৮) ১৩০২ সালে (পৌষ), 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?" আলোচ্য গল্পটি যেন সে-কথার প্রেক্ষাপটকেই ধারণ করে আছে। বাগাড়ম্বর নয়— কর্মমুখরতাই উন্নতি বা বিকাশের প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু বাঙালি মানস কর্মের বিপরীতে অতিকথনের প্রতি যে পক্ষপাত আবহমানকাল ধরে দেখিয়ে এসেছে— গল্পটি তারই প্রতি কটাক্ষপাত। গল্পের শাহেদ চরিত্রটির কথনবিমুখতার উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এই কথনহীনতাই লেখকের কাম্য। লেখকের ভাষায় :

> সামাজিক নিউরসিসের বিরুদ্ধে তোর এই বিদ্রোহ আমি মনে প্রাণে সমর্থন করি। এই বাক সর্বস্ব জাতের গালে এর চেয়ে বড় চপেটাঘাত আর কিছুই হতে পারে না। (শামসুদ্দীন, ১৯৮৭ : ৯০)

মজা গাঙের গান গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত-শ্রেণি চরিত্রগুলোর মধ্যে দৈশিক ভাবনার তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এ-জাতীয় চরিত্রগুলো দেশ সম্পর্কে কখনও আন্তরিক, কখনও দোলাচল-ভাবনায় নিমজ্জিত আবার কখনও দেশের মাঙ্গলিক দিক থেকে বিচ্যুত। মূলকথা অস্থির প্রবহমান সময়-স্রোতের সমান্তরালে মধ্যবিত্ত-শ্রেণি চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ভাবনার রূপটি ফুটে উঠেছে।

তিন ॥ উচ্চবিত্ত শ্রেণির স্বদেশচেতনা

মজা গাঙের গান গল্পগ্রন্থে উচ্চবিত্ত শ্রেণি-সমাজের স্বদেশচেতনার অবস্থানটি সুস্পষ্ট। এ-জাতীয় চরিত্রগুলোর মধ্যে একশ্রেণির চরিত্র দেশ সম্পর্কে উন্নাসিক এবং আরেক শ্রেণির চরিত্র দেশ সম্পর্কে খাঁটি দেশপ্রেমিকের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া উচ্চবিত্ত শ্রেণির চরিত্রে পরিবর্তনের যে মানসিকতা তা এ-জাতীয় গল্পের অবয়বে ফুটে উঠেছে।

'নেপথ্যে' গল্পের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে যন্ত্রসভ্যতার বদৌলতে একটি উচ্চবিত্ত সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দময় পরিবেশের একটি চিত্র। যন্ত্রসভ্যতা এবং আকাশসংস্কৃতি এদেশের মানুষগুলোকে যে দিন দিন দেশীয় সভ্যতাবিমুখ-মূল্যবোধহীন করে পাশ্চাত্য সভ্যতামুখী করে তুলছে তা গল্পের পটভূমিতে চিত্রায়িত।

গৃহে যান্ত্রিকসভ্যতার ফসল টেলিভিশনের আগমন ঘটায় নতুন আনন্দের জোয়ার জেগেছে। এ-জোয়ারে যোগ দিয়েছে পাশের বাড়ির ঝি-চাকর পর্যন্ত। গৃহকর্তা এ গল্পে বৈষয়িক লোক হলেও একেবারেই স্বার্থান্ধ নয়। কাজের মেয়ের প্রতি তার স্নেহটুকু তাকে মানবিক করেছে। অবশিষ্ট চরিত্রগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতায় গা ভাসিয়ে দেশীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দিয়েছে। গল্পের ভাষায় :

> জানো বু, হীরোটার সঙ্গে আমাদের ইয়েগুলোর কোনো তুলনাই হয় না। ইশ্! ওর সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে আর বেহেশেতেও যেতে চাইবে না।...ইলেকট্রনিক ইমপালসের লাইফস্টাইল তৈরি করতে হবে। ডিয়ার ভগ্নি, ডেভেলপড দেশগুলিতে তা ইতিমধ্যেই বেশ চালু হয়ে গেছে। (শামসুদ্দীন, ১৯৮৭ : ২৯)

এ-গল্পে যন্ত্রসভ্যতার প্রতি নির্ভরতা, দৈশিক মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সংঘর্ষের স্বরূপটি স্পষ্ট। তাছাড়া সমাজস্থ মানুষের মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। দৈশিক মুল্যবোধের যে পতন ঘটেছে তা রোকেয়ার প্রস্থানের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতি যে তিরোহিত হতে চলেছে গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের পাশ্চাত্যমুখিতা তারই প্রমাণ করে।

'সুটকেস' গল্পটিতে পাশ্চাত্যের দিকে মুখ ফেরানো যান্ত্রিক সভ্যতায় সম্পৃক্ত সুবিধাকাঙ্ক্ষী মানুষের যাপিত জীবনের কাহিনি স্থান পেয়েছে। গল্পের মূলসুরটি একটি সুটকেসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গল্পের কেন্দ্রীয় কর্তা ব্যক্তিটি দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে শ্রমার্জিত অর্থ ও প্রাচুর্য নিয়ে দেশে ফিরেছে। কিন্তু দেশে ফিরে যন্ত্র সভ্যতার সুবিধা ও পরিবেশে অভ্যস্ত মানুষটি আবার বিদেশ যেতে তৎপর। অর্থলোভী, যান্ত্রিকতা আকাঙ্ক্ষী কর্তা চরিত্রটি দেশীয় জিনিসের প্রতি উন্নাসিক মনোভাবগ্রস্ত। তার উচ্চবিত্তসুলভ মানসিকতাটি স্পষ্ট : "দেখো, এই দেশ এখনো কোথায় আছে। এইটা কী একটা কথা হইলো না কী! এই এতো বড় ক্যাপিটাল শহরে এইটা মেরামতের ব্যবস্থা করণ গেল না!" (শামসুদ্দীন, ১৯৮৭ : ৬৭)

যন্ত্রসভ্যতা মানুষের হৃদয়বৃত্তিক লেনদেনের পরিবর্তে বস্তুভিত্তিক প্রীতির যে ধারা গড়ে তুলেছে তা 'সুটকেস' গল্পের সমস্ত কলেবরে উপস্থাপিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার যন্ত্রমগ্নতার ভোগ-বিলাস দৈশিক সাধারণত্ববিলীন প্রাচ্য মানুষের সামাজিকতা, মূল্যবোধ ও আন্তরিকতা

থেকে বিবর্জিত হয়েছে। স্বার্থমগ্নতা, অর্থপ্রীতি, জলুসপূর্ণ জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের আত্ম-অস্তিত্বকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে। এ-বিষয়টির প্রতি গল্পকার সুটকেসের অন্তরালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছেন।

'দায়-দাবি' গল্পটি বাঙালির বিকৃত মনস্তত্ত্বের বিপরীতে দেশপ্রেমের গল্প। গল্পের ভদ্রমহিলা আপন কন্যার জন্য আর্থিকভাবে সচ্ছল, শিক্ষিত, পাশ্চাত্য জীবন-শৈলী ও রুচিতে অভ্যস্ত পাত্র আকাঙ্ক্ষী। ভদ্রমহিলা চরিত্রে পাশ্চাত্যপ্রীতি, অর্থপ্রীতি এবং দেশ সম্পর্কে উন্নাসিক ভাবনাটি উপস্থাপিত। তাই তিনি নিজ পরিবারে দেশীয় মূল্যবোধের বিপরীতে পাশ্চাত্যমুখী পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, জীবন-ভাবনা প্রচলনে তৎপর হন। অন্যদিকে গৃহকর্তা চরিত্রে স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহ্য ভাবনার দিকটি স্পষ্ট। গল্পের পুত্র চরিত্রে বাবার জীবনভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গৃহকর্তার ব্যর্থতার বিপরীতে নিজ পুত্রের ঐতিহ্য-প্রীতি ও নস্টালজিক মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তার বাঙালি ললনার পাণিগ্রহণের আর্তিতে গল্পটির ইতি ঘটেছে।

'দায়-দাবি' গল্পে বাঙালির মানস প্রবণতায় পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং বিকৃত রুচির পরিচয় প্রকাশিত। পাশাপাশি দেশীয় মূল্যবোধতাড়িত শিকড় সন্ধানী মানুষের জীবনদৃষ্টি যে জন্মভূমিতে নিমগ্ন সে বিষয়টিকেও লেখক সমান গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেছেন। আত্মপরিচয়ভোলা বাঙালির স্বভাবসুলভ-মানসিকতা যে পরিচয়হীন ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিয়েছে তা অন্তর্দ্বন্দ্বময় 'ভালো ছেলে'-এর ভাবনায় অভিব্যক্ত। দৈশিক মূল্যবোধ লালিত গ্রামীণ জীবনের আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যেই যে বাঙালি সত্তা প্রস্ফুটিত এবং নির্মল জীবনের সুর ঝংকৃত তা গল্পের জীবনভাবনায় প্রতীকায়িত :

> একটা কিছু করতে পারার আনন্দ আমাকে অস্থির করে তুলেছে। জগৎজুড়ে সবকিছুই নমরুদের প্রাসাদের মতো তার সাম্রাজ্যের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে। আমি সেই স্তূপের তলায় কবরস্থ হতে চাইনে। তোমার কাছেই শিখেছি। এমন ধ্বংস মানুষ বহুবার ডেকে এনেছে। কিন্তু জীবন আবার নোতুন করে জেগেছে। সেই জাগৃতিতে অংশ নিতে না পারলে এ জীবনধারণে কোন তৃপ্তিই আমি খুঁজে পাবো না। আমারও পরবর্তীদের কাছে কিছুই বলার বা দেবার থাকবে না। (শামসুদ্দীন, ১৯৮৭ : ৮২)

আত্মানুসন্ধানী 'ভালো ছেলে'-র বক্তব্যের অন্তরালে লেখকের জীবনাভাবনার প্রতিচ্ছবিকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। বার বার পথহারা-ভূলুণ্ঠিত বাঙালিকে তিনি পুনরায় আত্ম-মূল্যবোধ এবং আত্ম-সংস্কৃতি বিনির্মাণের তাগিদ দিয়েছেন 'দায়-দাবি' গল্পে। এদেশের মানুষ যে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্বিপাকে নিমজ্জিত তা গল্পকার উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। নব-জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় গল্পের সমস্ত কলেবরে প্রকাশিত।

'একটি প্রবন্ধের গল্প'-এ লেখকের স্বদেশভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। গল্পের কাহিনি-বিন্যাস এবং পরিচর্যার মধ্যেও দেশভাবনার চিন্তাটি স্পষ্টরূপ পেয়েছে। গল্পের কাঠামোটি এক দাদু ও তার কিশোরী নাতনিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নাতনির প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার সম্পর্কসূত্রে লেখকের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

দাদু চরিত্রটি চিন্তাশীল, দেশপ্রেম ও দেশগঠনের চিন্তায় ব্যাপৃত। সূক্ষ্মচিন্তা, বাস্তবতাবোধ এবং দেশের প্রতি নির্ভেজাল মমত্ব চরিত্রটিকে সজীবতা দান করেছে : "যে দেশের মানুষের বোধ-বুদ্ধি আছে সত্যিকারের শিক্ষা আছে, সেখানে কোনও অন্যায়েরই টিকে থাকা সম্ভব হতে পারে না।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৯৭) গল্পের কিশোরী চরিত্রে বালখিল্য মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হলেও স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও সচেতনতা উপস্থিত। গল্পের ভাষায় : "মেয়েদের আর কেবল খেলার পুতুল কী ঠাট্টা মজার জিনিস বলে ভাববার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদেরও দেশ বলুন সমাজ বলুন— সব গড়ন গঠনের ব্যাপারেও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল নেবার দিন এসেছে।" (শামসুদ্‌দীন, ১৯৮৭ : ৯৩) এ উক্তির মধ্যে যুগকাল এবং অধিকার সচেতনতার মনোভাব পূনর্মূল্যায়নের তাগিদ স্পষ্ট। দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া যে সফলতা সম্ভব নয় তা গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন। সর্বস্তরের মানুষের দৈশিক উন্নয়নের অভিপ্রায় এবং তার জন্য বিচ্ছিন্নতামুখী প্রবণতা রোধ করে সমবেত প্রচেষ্টার দিকটি শিল্পনির্দেশক হিসেবে উপস্থাপিত।

মজা গাঙের গান গল্পগ্রন্থে উচ্চবিত্ত শ্রেণি-সমাজের সনাতন মূল্যবোধে ভঙ্গুর স্বদেশ-চেতনার রূপ ও পাশ্চাত্য আবেগ-তাড়িত দেশপ্রেমহীনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য আবেগের মূল্য দিতে গিয়ে তারা নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি থেকে হয়েছে সমাজসত্তাবিচ্ছিন্ন। তবে 'একটি প্রবন্ধের গল্প'-এর 'দাদু' ও 'কিশোরী' চরিত্র এক্ষেত্রে দৈশিক-ভাবনায় আন্তরিক। ফলে এ-জাতীয় চরিত্র দেশপ্রেমহীনতার বিপরীতে স্বদেশ-ভাবনায় সমুজ্জ্বল।

মজা গাঙের গান বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান পর্বে আপন সংস্কৃতির বিসর্জন তাঁকে ব্যথিত করেছিল এবং সেই বেদনা-বোধ থেকেই তিনি বাংলাদেশ পর্বে এ-গ্রন্থে নব-জীবনের উদ্বোধন করেছেন। প্রতিটি গল্পের অন্তর্বুননে যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার একটিই লক্ষ্য : নবউদ্যোগে দৈশিক ভাবনা। তিনি তাঁর ভাবনার বীজকে নিজস্ব জীবন এবং সমাজ-পরিমণ্ডলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। জীবনরূপায়ণের এ-বৈশিষ্ট্য তিনি সমাজ অনুধ্যান থেকে লাভ করেছেন। অধিকাংশ গল্পের অভিব্যক্তি প্রায় অভিন্ন। দেশ-কাল চেতনা, মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ব্যক্তিসত্তার রূপান্তর, দৈশিক চেতনার পরিবর্তনের উন্মাতাল ঢেউ প্রভৃতি গল্পগুলোতে বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং উত্তরকালের পটভূমিতে বাঙালি সমাজ ও মানসের যে রূপান্তর সাধিত হয়েছে তা গল্পকার অন্তঃপ্রবাহী চেতনাস্রোতের মাধ্যমে বিভিন্ন গল্পের কলেবরে তুলে ধরেছেন। গল্পের মৌলপ্রবণতা দৈশিক মূল্যবোধস্থিত সামাজিক অবকাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করলেও সনাতনী মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা লেখকের কাম্য নয়। প্রত্যেকটি গল্পে তিনি শেকড় সন্ধানী মনোভাবের যথার্থ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি এ-গ্রন্থে দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নবজীবনকে আহবান করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আজহার ইসলাম ১৯৯৬। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আবদুল মতিন ২০০০। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*। র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
ইয়াহ্ইয়া মান্নান ২০০৮। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
খালেদা হানুম ১৯৯৭। বাংলাদেশের ছোটগল্প। এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।
বুলবুল ওসমান সম্পাদিত, ২০০৩। *শওকত ওসমান গল্পসমগ্র*। সময় প্রকাশন, ঢাকা।
মোহাঃ সাইদুর রহমান ২০১১। *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ১৯৫৫। *কাশবনের কন্যা*। মুক্তধারা , ঢাকা।
শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ১৯৮৭। *মজাগাঙের গান*। মুক্তধারা , ঢাকা।
সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, ১৯৯৮। *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।